২১ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা মার্চ ২০১২

আলাপ

সহজ ভাষার মাসিক পত্রিকা

নারী পুরুষ সবাই মিলে
দেশ করেছি স্বাধীন
করব কাজ গড়ব জীবন
আনব দেশের সুদিন

ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন

সম্পাদকীয়

- ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ১৯১০ সালে ৮ মার্চকে 'নারী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এরপর থেকে সারা দুনিয়ায় দিবসটি পালন করা হয়। আমাদের দেশেও দিবসটি গুরুত্বের সাথে পালিত হয়েছে। এবার নারী দিবস উপলক্ষে সারা দেশে নানা রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। 'নারী দিবস' উপলক্ষে সবাই বলেছে নারীর উপর নির্যাতন করা যাবে না। নারীর অধিকার দিতে হবে।
- মার্চের ২৬ তারিখ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে আমাদের দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। তারপর শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। দেশের নারী-পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক সাথে যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। পরাধীন দেশকে স্বাধীন করেছে।

৪১ বছর হলো আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু এখনও দেশের মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হয় নি। এখনও সেই স্বপ্নের দেশ গড়া সম্ভব হয় নি। নারী পুরুষের মিলিত চেষ্টা ছাড়া কখনই এই আশা পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। নারীর অধিকারের কথা শুনলে এখনও অনেকেই আঁতকে ওঠে। অথচ দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। এই অর্ধেক মানুষ বাদ দিয়ে কখন দেশের উন্নয়ন ঘটবে না। বিষয়টি নিয়ে সবাইকে ভাবতে হবে। নারীর অধিকার রক্ষায় সবারই কাজ করতে হবে। তাহলেই আমরা আমাদের দেশকে স্বপ্নের দেশ হিসেবে দেখতে পাব।

আলাপ

২১ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা
মার্চ ২০১২

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ড.এম. এহছানুর রহমান

সম্পাদনা পর্ষদ
দেওয়ান ছোহরাব উদ্দীন
মোহাম্মদ মহসীন

সহযোগী সম্পাদক
লুৎফুন নাহার তিথি

অলঙ্করণ
এম. এ. মান্নান
রফিকুল ইসলাম ফিরোজ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
সেকান্দার আলী খান

কোন পাতায় কী আছে

- একজন নারী মুক্তিযোদ্ধা... ১-২
- গল্প: বুদ্ধিঘর ৩-৪
- সীতালাউ: নতুন সবজি ৫-৬
- কথামালা:নারী দিবস ৭
- পাঠকের পাতা ৮-৯
- পোকামাকড়ের উপদ্রব ও দমন ১০-১১
- কাপড়ের দাগ দূর করতে করণীয় ১২
- সালমার প্রতিভা ১৩
- মাথা খাটানোর খেলা ১৪

মূল্য : ২০.০০ টাকা

একজন নারী মুক্তিযোদ্ধা হেলেন করিম

১৯৭১ সালে শুরু হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। এ যুদ্ধে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও অংশ নেন সাহসের সাথে। অস্ত্র হাতে সরাসরি যুদ্ধ করেন অনেক বীর নারী। কেউ কেউ যোদ্ধাদের কাছে পৌঁছে দেন গোপন খবর। যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়াও নারীরা কাজ করেন নানাভাবে। কেউ কাজ করেন ডাক্তার হিসেবে। কেউ বা সেবিকা হিসেবে। আমরা আজকে এরকমই একজন নারী মুক্তিযোদ্ধার কথা জানব।

এই মুক্তিযোদ্ধার নাম মির্জা হেলেন করিম। টাঙ্গাইলের এক ধনী পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতার নাম মির্জা শুকুর আহমেদ এবং মা আনোয়ারা খাতুন। টাঙ্গাইলে জন্ম হলেও ঢাকাতেই বড় হয়েছেন তিনি। তিন মাসের ছোট্ট শিশুকে রেখে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেন। রাজাকারদের উপর হামলা চালাতে মুক্তি সেনাদের সাহায্য করেন।

১৯৭১ সালে যুদ্ধ শুরুর সময় বদরুন্নেসা কলেজের ছাত্রী ছিলেন তিনি। কলেজ জীবন থেকেই রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে বিষয়টি বেশি প্রেরণা জোগায়- ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। এ সময় যুদ্ধের জন্য টাঙ্গাইলে স্বেচ্ছাসেবী দল তৈরি হয়। এটা জানার পর ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল চলে আসেন তিনি। তিন মাসের সন্তানকে বাড়িতে রেখে অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ নেন। এরপর যুদ্ধের নয় মাস টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

প্রথমদিকে পুরুষ মুক্তি যোদ্ধাদের সাথে পাকসেনা এবং রাজাকারদের উপর নজর রাখতেন। বন্দুক নিয়ে পাহারা দিতেন চর এবং নদীর তীরবর্তী এলাকায়।

রাজাকারদের কাছে মুক্তি যোদ্ধাদের এই খবর পৌঁছে যায়। একদিন আট-দশটা গানবোট নিয়ে ঐ চর এলাকা ঘিরে ফেলে পাকিস্তানি সেনারা।

আত্মরক্ষার জন্য সেদিন সকল যোদ্ধা ঐ এলাকা থেকে সরে পড়েন। কিন্তু মনোয়ারা নামের এক নারী যোদ্ধা ধরা পড়েন। নির্যাতিত হন পাকিস্তানি সেনাদের হাতে।

এই ঘটনার পর কমান্ডার ইদ্রিস আলী মেয়েদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেন। এজন্য তাঁদের কাছ থেকে বন্দুকগুলো নিয়ে নেন তিনি। তবে হেলেনকে তিনি একটি বিশেষ দায়িত্ব দেন। তাঁর উপর দায়িত্ব পড়ে সিরাজগঞ্জ এবং টাঙ্গাইলের চর অঞ্চলে গ্রেনেড পারাপার করার। গ্রেনেড হলো একধরনের বোমা।

এ কাজের জন্য হেলেন গরিব মেয়ের ছদ্মবেশ ধরতেন। পাতিলে গ্রেনেড ভর্তি করে তার উপর ডিম সাজিয়ে নিতেন। তারপর নৌকা করে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পৌঁছে দিতেন এসব গ্রেনেড। অনেক সময় পাকসেনা এবং রাজাকারদের সাথে একই নৌকায় গ্রেনেড নিয়ে নদী পাড়ি দিতে হয়েছে তাঁকে।

এরকমই একদিনের কথা। দুই জন পাকসেনা আর তিন জন রাজাকার নৌকায় উঠেছে। সেই নৌকায় হেলেনও ছিলেন। ওরা তাঁকে জিজ্ঞেস করে-কোথায় নামবে সে? মুক্তিযোদ্ধাদের বলে দেওয়া একটি জায়গার নাম বলেন হেলেন। সেখানে তাঁকে নামানোর জন্য তীরে নৌকা ভিড়ায় তারা। সাথে সাথেই লুকিয়ে থাকা মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানীদের উপর গুলি চালায়। এতে দুই জন পাকিস্তানি সেনা এবং একজন রাজাকার সেখানেই মারা যায়। অন্য দু'জন রাজাকারকে ধরে আনা হয়।

এভাবেই দিনের পর দিন শত্রুপক্ষের খবর এনে দিতেন হেলেন। আর তাঁর তথ্যের উপর ভিত্তি করে মুক্তিযোদ্ধারা সফল অভিযান চালাতেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও বসে নেই এই নারী যোদ্ধা। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাজের সাথে জড়িত রয়েছেন। তাঁর বাসাতেই গঠিত হয় বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী। আমরা তাঁর সাহসী কাজকে সালাম জানাই। প্রার্থনা করি, তাঁর মতো নারীর জন্ম হোক দেশের প্রতি ঘরে ঘরে।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

যুদ্ধের সময় অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন মির্জা হেলেন করিম

গল্প

বুদ্ধিঘর

বিশাল সাগর। সাগরের পারে গড়ে উঠেছে ছোট একটি গ্রাম। গ্রামের নাম 'সাগরভাসা'। গ্রামের পিছনে আছে উঁচু উঁচু পাহাড়। সেখানে রয়েছে ছোট-বড় নানা রকম গাছপালা। সব মিলিয়ে গ্রামটি দেখতে ছবির মতো সুন্দর।

এত সুন্দর একটি গ্রাম। কিন্তু এই গ্রামের মানুষের খুব কষ্ট। কারণ তাদের মাথায় বুদ্ধি নেই বললেই চলে। তাই বুদ্ধি খাটিয়ে নতুন কোনো কাজ করতে পারে না তারা। তাই তারা খুবই গরিব। কোনো রকমে খেয়ে পরে তাদের জীবন চলছিল।

একদিন এক জাহাজ এসে ভিড়ল সেই গ্রামের ধারে। জাহাজ থেকে নেমে এল কয়েকজন মানুষ। কারণ তাদের জাহাজে খাবার ও পানি শেষ হয়ে গেছে। শুনে গ্রামের মানুষ বলল-'আমরাই তো খাবার পাই না। তোমাদের দিব কোথা থেকে। তবে যতটা পারো পানি নিয়ে যাও।'

শুনে জাহাজের একজন মানুষ বলল তোমাদের মাথায় কী বুদ্ধি নাই? তোমাদের চারপাশে এত সম্পদ। তোমরা এগুলো ব্যবহার করলেই তো পারো। তাহলেই তো তোমাদের আর অভাব থাকবে না।' বলে ওরা পানি নিয়ে চলে গেল।

গ্রামের মানুষ এবার বিষয়টি নিয়ে ভাবতে বসল। ভেবে দেখল, আসলে তারা খুব বোকা। কারণ তাদের গাঁয়ে কোনো বুদ্ধিমান মানুষ নেই। এজন্যই সবার এই অবস্থা! এখন বুদ্ধি পাওয়া যায় কোথায়? একজন বলল, খুঁজলে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও বুদ্ধি পাওয়া যাবে। সেখানে গেলেই দেখা যাবে কারো মাথা থেকে বুদ্ধি গড়িয়ে পড়ছে। সেখান থেকেই আমরা না হয় খানিকটা বুদ্ধি যোগাড় করব।

তখন গ্রামের সবাই মিলে দুইজনকে পাঠাল বুদ্ধি কিনতে। তারা নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াল। কিন্তু কোথাও বুদ্ধি গড়িয়ে পড়তে দেখল না। শেষে একজনকে ডেকে বলল, 'ভাই আমরা দূর দেশ থেকে এসেছি। আমাদের কিছু বুদ্ধি দরকার। কিন্তু কারো মাথা থেকে বুদ্ধি গড়িয়ে পড়তে দেখছি না। এখন কী করব?' শুনে লোকটি বুঝল, বোকাদের পাল্লায় পড়েছে। সে ভাবল, একটু মজা করা যাক তাহলে!

লোকটি বলল, 'আমি তোমাদের একটু বুদ্ধি যোগাড় করে দিতে পারি। তবে একটা শর্ত আছে। আমার বাড়িটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিতে হবে।' এতো সহজে বুদ্ধি যোগাড় হবে, ওরা ভাবতেই পারে নি। তাই সাথে সাথেই রাজি হয়ে গেল তারা।

কাজ শেষ হলে লোকটি তাদের একটা ছোট বাক্স দিল। বলল, 'অনেক কষ্ট করে পোয়া খানিক বুদ্ধি যোগাড় করেছি। তাড়াতাড়ি গ্রামে নিয়ে যাও। তবে সাবধান! রাতের আঁধার ছাড়া কিন্তু বাক্স খোলা যাবে না। নইলে বুদ্ধি পালিয়ে যাবে।'

খুশি হয়ে দু'জন ফিরে এল গ্রামে। গ্রামে এসে তারা ভাবল, এতো কষ্ট করে বুদ্ধি যোগাড় করলাম। সবাইকে তা আবার ভাগ করে দিতে হবে! তখন দু'জনে ঠিক করল, খানিক বুদ্ধি নিজেদের জন্য রেখে দিবে। যেই ভাবা, সেই কাজ। একটা ঘরে ঢুকে তারা বাক্সটি খুলল। সাথে সাথেই কী একটা যেন দিল দৌড়। আসলে বাক্সে ভরা ছিল একটা ইঁদুর। কিন্তু ওরা ভাবল, এই রে! দিনের আলোয় বাক্স খুললাম। বুদ্ধি বুঝি তাই পালিয়ে গেল! ভয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল দু'জন।

তাদের কান্না শুনে জড়ো হলো গ্রামের সব মানুষ। জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে? ওরা তখন সব ঘটনা খুলে বলল। সব শুনে সবাই মিলে তখন কাঁদতে বসে গেল। হঠাৎ একজন বলল, 'দরজা জানালা তো বন্ধ ছিল। বুদ্ধি পালিয়ে নিশ্চয়ই বেশি দূর যেতে পারে নি। ঘরেই আছে।' সবাই বলল, 'ঠিক কথা।' তখনই ঘরটা পাহারার ব্যবস্থা হলো। বুদ্ধি যেহেতু ঘরেই আছে তাই ঘরের নাম হয়ে গেল 'বুদ্ধিঘর'।

এরপর কোনো সমস্যা হলে সবাই এই বুদ্ধিঘরে যায়। কিছুক্ষণ বসে ভাবনা চিন্তা করে। ভাবতে ভাবতে একটা উপায় ঠিকই বের করে ফেলে।

এজন্য কেউ কেউ বলে এই বুদ্ধিঘরটাই নাকি এখনকার স্কুল। সত্যি কিনা জানি না, হলেও হতে পারে। কারণ স্কুলে গেলেই তো অনেক কিছু জানা যায়। আর আমাদের বুদ্ধিও বাড়ে।

লুৎফুন নাহার তিথি

সীতালাউ একটি নতুন সবজি

'সীতালাউ' বাংলাদেশের একটি অপরিচিত ফসল। সিলেট, চট্টগ্রামসহ দেশের পার্বত্য এলাকায় সামান্য পরিমাণে এর চাষ হয়ে থাকে। পুষ্টিকর এই সবজির চাষ সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া দরকার। তাহলে দেশের সবজি ও পুষ্টির অভাব কিছুটা হলেও কমানো সম্ভব হবে।

সীতালাউ দেখতে কেমন

কাঁচা অবস্থায় সীতা লাউ দেখতে হালকা সবুজ রঙের হয়। আর ফলের ভিতরে ফাঁপা থাকে। ফলের শাঁস হয় সাদাটে রঙের। পাকা ফল রসালো ও সুন্দর ঘ্রাণযুক্ত হয়। ফলের ওজন ৪০০-৮০০ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। ফুল দেখতে সাদা বা বেগুনী রঙের হয়।

ব্যবহার

কচি অবস্থায় খোসাসহ পুরো ফলটিই সবজি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। 'সীতালাউ' বেগুনের মতো ব্যবহার করা যায়। এজন্য অনেকে একে 'লতা বেগুন' নামেও চেনে। এছাড়া কুচি করে কেটে ভাজি হিসেবে বা তরকারিতে ব্যবহার করা যায়। এর স্বাদ অনেকটা চালকুমড়ার কাছাকাছি। তবে একটু মিষ্টি ভাব থাকে। পাকা ফলের খোসা ছাড়িয়ে টুকরা করে কেটে খাওয়া যায়। পাকা ফলের রস দিয়ে তৈরি শরবত খেতে খুব মজা। এছাড়া সিরাপ তৈরি করে ৯-১২ মাস পর্যন্ত ঘরে রাখা যায়। সীতালাউ গাছের মূল বা শিকড় সিদ্ধ করেও খাওয়া যায়।

চাষের নিয়ম

চুনামাটিতে এটি খুব ভালো জন্মে। তাই পাহাড়ী এলাকাতে এই ফলটি ভালো ফলন দিয়ে থাকে। তাছাড়া যেকোনো ধরনের মাটিতে এটি চাষ করা যায়। খুব বেশি শীত, গরম ও বৃষ্টিপাত কোনোটাই এ ফলের জন্য ভালো নয়। তবে এই গাছ কিছুটা হলেও খরা সহ্য করতে পারে।

চাষের নিয়ম

বীজ অথবা কাণ্ডের কলম দিয়ে সীতালাউয়ের চাষ করা যায়। তবে কাণ্ডের কলমই ভালো। কারণ শাখা কলমের গাছ মাতৃগাছের মতো ভালো ফল দিয়ে থাকে। এতে উৎপাদনও ভালো হয়। বীজ থেকে চারা উৎপাদনের জন্য নার্সারিতে বেড তৈরি করে নিতে হয়।

চারা রোপণ

জুন-জুলাই মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। ১০-১৫ দিনের মধ্যে বীজ গজিয়ে অঙ্কুর বের হয়ে আসে। ৩০-৪০ দিন পর চারা লাগানোর উপযোগী হয়। তাই বর্ষার শুরুতে সীতালাউয়ের চারা লাগানোর সঠিক সময়। সেচ সুবিধা থাকলে বছরের যেকোনো সময় চারা লাগানো যেতে পারে। গর্ত করে কলম/চারা লাগিয়ে দিতে হয়। দেশের পার্বত্য এলাকার বিভিন্ন নার্সারিতে সীতালাউয়ের চারা বা কলম পাওয়া যায়।

বাউনি দেয়া ও ছাঁটাইকরণ

সীতালাউয়ের গাছ লতানো গাছ। এজন্য লাউ-কুমড়ার মতো এই গাছেও বাউনি দিতে হয়। ভালোভাবে যত্ন নিলে গাছ ১০-১৫ বছর পর্যন্ত ফল দিয়ে থাকে। সাধারণত নতুন শাখায় সীতালাউয়ের ফল ধরে। সেজন্য মাঝে মধ্যে ডালপালা ছাঁটাই করে দিতে হয়। বেশি ভালো হয় শীতের শেষ দিকে লতা ছাঁটাই করলে।

ফল সংগ্রহ ও ফলন

সারা বছর সীতালাউয়ের ফল ধরে। ২-৩ বছরের একটি গাছ থেকে বছরে ১৬-৫০টি পর্যন্ত ফল পাওয়া যেতে পারে।

চারা লাগানোর ৪-৬ মাসের মধ্যে গাছে ফুল আসে। ফুল ফোটার ২৫-৩৫ দিনের মধ্যে ফলের ওজন ৪০০-৮০০ গ্রাম হয়ে যায়। এ অবস্থায় এটা সবজি হিসেবে ব্যবহার উপযোগী হয়। পাকা ফল সংগ্রহের জন্য আরো ২ মাস অপেক্ষা করতে হয়।

সীতা লাউ

অন্য গাছ বেয়ে উঠেছে সীতা লাউ গাছ

সীতা লাউয়ের বীজ

আ.শ.ম. বাবর আলীর

কথামালা

নারী দিবসে

আন্তর্জাতিক নারী দিবস
আট তারিখ মার্চ মাসে,
নারীর অধিকারের কথা
বলতে এ দিন আসে।

পুরুষ যেমন এই সমাজে
যে অধিকার পায়,
তাদের মত সমান সুযোগ
নারীরাও যে চায়।

সে অধিকার নিতে হবে
আপন যোগ্যতাতে,
তেমনিভাবে নিজকে গড়ো
কর্ম সাধনাতে।

যোগ্যতাতে নিজকে তুমি
গড়তে যদি পারো,
তোমায় পিছে রাখবে ফেলে
সাধ্য তো নেই কারো।

শোনো বন্ধু শোনো

শোনো ওগো বন্ধু শোনো
শোনো এক কাহিনী
মানুষ কাটাত এক সময়
দুঃখ ভরা রজনী।
সতেজ সবুজ এই দেশেতে
দানবেরা দিল হানা
পুড়ে ছারখার মাঠের ফসল
মানুষের সব আস্তানা।
বাংলার মানুষ সইতে না পেরে
উঠল হয়ে দুর্জয়
শোনো বন্ধু, সেদিনই হলো
স্বাধীনতার বিজয়।

সালমা
আবসর গণকেন্দ্র, রতনহাট
ঝিনাইদহ।

বাংলার জন্য

বাংলার জন্য লিখেছি আমি
নতুন একটি গান।
যার সুরেতে মিশে আছে
লক্ষ কোটি প্রাণ।
বাংলার জন্য লিখেছি আমি
নতুন একটি কবিতা
যার প্রতিটা চরণে আছে
মায়ের আদর মমতা।
বাংলার জন্য যাঁরা দিল
নিজের রক্ত বিসর্জন
ভুলবো না তাঁদের জন্য
স্বাধীনতা করেছি অর্জন।
তাঁদের জন্য জেগেছে আজ
নতুন তাজা প্রাণ
সেই প্রাণেতে মিশে আছে
বাংলার সেই মান।

মাধুরী মন্ডল
সিএজি সদস্য, প্রবন্ধ গণকেন্দ্র
সাগরদত্তকাঠি, কেশবপুর,যশোর।

বাংলাদেশের ছবি

বাংলাদেশের নামটি বড়
মায়া দিয়ে মাখা
স্বাধীনতার রঙ তুলিতে
মধুর ছবি আঁকা।

স্বাধীনতার এই ছবিটি তাই
মনের মাঝে আছে
এই ছবিটি দামি অতি
সব বাঙালির কাছে।

তাসনিয়া মোহাইসিন সেমন্তি
৫ম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নুন স্কুল,
ধানমন্ডি, ঢাকা।

বাংলাদেশ

ধানের দেশ,গানের দেশ
আমাদের এ বাংলাদেশ
অনেক রক্তের বিনিময়ে
স্বাধীনতা পেলাম বেশ।
পাখির দেশ,নদীর দেশ
সবার প্রিয় বাংলাদেশ
ছয় ঋতুতে সাজানো আছে
সুন্দর খুব পরিবেশ।

সীমা আক্তার
রোল-২২, শ্রেণি-৬ষ্ঠ
আলোর পথে ইউসিএলসি,ঢাকা।

পোকামাকড়ের উপদ্রব ও দমন

পোকামাকড়ের উপদ্রব খুব সাধারণ একটি সমস্যা। পোকামাকড় বলতে- মশা,আরশোলা, ইঁদুর ইত্যাদি। এসব পোকামাকড় বাড়িতে শুধু সমস্যাই বাড়ায় না, নানা রকম রোগও ছড়ায়। পোকা দমন করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। আমরা এখন এসব পদ্ধতি সম্পর্কে জানব।

পোকা দমনের পদ্ধতি

বাজারে পোকামাকড় দমনের বিভিন্ন রকম ওষুধ পাওয়া যায়। যেমন- আরশোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের চক। ইঁদুরের হাত থেকে রেহাই পেতে লাল গমের দানার মতো ওষুধ, জাঁতাকল, বাক্সকল ইত্যাদি। অন্যান্য পোকার উপদ্রব থেকে রেহাই পেতে পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক। তবে এসব ওষুধ বা কীটনাশক আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। তাই ওষুধ ব্যবহারের সময় সতর্ক থাকা উচিত। এজন্য আমরা কিছু ব্যবস্থা নিতে পারি।

ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে করণীয়

- পোকামাকড় মারার ওষুধ অবশ্যই রাতে দিতে হবে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই আবার পরিষ্কার করতে হবে।
- ইঁদুর মারার ওষুধ খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয়। তাহলে দ্রুত ইঁদুর মারা যায়।
- কাপড়ে ন্যাপথালিন দিলে পোকা ধরার ভয় কম থাকে। কাপড়ে সুন্দর গন্ধ থাকে।
- মাছি দূর করতে গুড়ের সঙ্গে ফিনিশ পাউডার মিশিয়ে দিলে ভালো কাজ হয়।

- বৃষ্টির সময় ঘরের দেয়ালে উইপোকার উপদ্রব বেশি দেখা যায়। এ থেকে রেহাই পেতে কর্পূরের গুঁড়া ব্যবহার করা যেতে পারে।

ঘরোয়া পদ্ধতিতে পোকা দমন

কিছু কিছু ঘরোয়া পদ্ধতি রয়েছে। যার সাহায্যেও আমরা সহজেই পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি। যেমন-

- আলমারিতে বা কাপড় রাখার জায়গায় শুকনো নিমপাতা দিলে ভালো কাজ হয়।
- কাপড় রাখার জায়গায় কালোজিরার পুঁটলি রেখে দিলেও পোকা আক্রমণ কম হয়।
- চিনির কৌটায় দু-একটা লবঙ্গ রেখে দিলে পিঁপড়ের উপদ্রব কম হয়।
- রান্নাঘরে শুকনো নিমপাতার গুঁড়ো ছড়িয়ে রাখলে পোকার উপদ্রব কম হয়ে থাকে।
- ইঁদুরের হাত থেকে রেহাই পেতে ইঁদুরের গর্তের মুখে মরিচের ধোঁয়া দেয়া যেতে পারে। এ ছাড়া ইঁদুরের গর্তে পানি ঢাললেও ইঁদুরের উপদ্রব কমে।
- সব সময় ঘরের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার রাখতে হবে। অকেজো জিনিসে পোকা বংশ বিস্তার করে। তাই অকেজো কোনো জিনিস ঘরে রাখা যাবে না।
- বাড়ির আশপাশের নালা বা নর্দমা আবর্জনামুক্ত রাখতে হবে। তাহলে মশার আক্রমণ কম হবে।
- গন্ধযুক্ত খাবার খোলা অবস্থায় রাখা ঠিক না। খাবার খোলা থাকলে মশা-মাছির উপদ্রব বাড়ে।

কাপড়ের দাগ দূর করতে করণীয়

অনেক সময় দাগ লেগে কাপড় নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়। তবে কাপড় থেকে দাগ তোলার কিছু সহজ পদ্ধতি আছে। এসব পদ্ধতি অনুযায়ী কাপড় পরিষ্কার করলে দাগ উঠে যায়। নিচে এমনই কিছু পদ্ধতির কথা বলা হলো-

- অনেক সময় চা পড়ে কাপড়ে দাগ পড়ে যায়। এরকম হলে পানিতে বোরিক পাউডার মিশিয়ে কাপড় ভিজিয়ে রাখতে হয়। এ ক্ষেত্রে কুসুম গরম পানি নিতে হবে। এরপর পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়।
- ডিম বা মাংসের দাগ লাগলেও কাপড় নষ্ট হয়ে যায়। এরকম হলে ঠান্ডা পানিতে লবণ মিশিয়ে কাপড় ভিজিয়ে রাখুন। তারপর সাবান দিয়ে ধুয়ে নিন, দাগ উঠে যাবে।
- তরকারির তেল ও হলুদ দাগ তোলার জন্য কাপড়ে ট্যালকম পাউডার ছড়িয়ে রাখুন। পরের দিন কাপড়টা সাবান পানিতে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নিন। ভিজিয়ে রাখুন। এরপর ধুয়ে নিন।
- কাপড় থেকে ফলের রসের দাগ তুলতে প্রথমে অ্যামোনিয়া দিন। কিছুক্ষণ পরে পেট্রোল দিয়ে ঐ জায়গায় ভিজিয়ে রাখুন। এতে কাপড়ের রঙের কোনো ক্ষতি হয় না।
- জামায় কাদা লাগলে তখনই না ধুয়ে শুকোতে দিন। এরপর পানিতে গুঁড়া সাবান মিশিয়ে জামা কিছুক্ষণ
- কাপড়ে পানের দাগ লাগলে সেই জায়গায় লেবু অথবা দই লাগিয়ে রাখুন। এভাবে কিছুক্ষণ রাখলে দাগটা ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসবে।

সালমার প্রতিভা

শিক্ষা গ্রহণের অধিকার সবার জন্য সমান। এই সুযোগ পেলে সব বাঁধা দূর করা যায়। পাশাপাশি নিজের প্রতিভারও প্রকাশ করা যায়। এ সত্য বুঝতে পেরেছে সালমা। আর তাই চোখের দৃষ্টি না থাকার পরও সালমা এখন পড়ালেখা শিখছে। সালমার পুরো নাম মোছাঃ সালমা আক্তার। তার বাবার নাম মোঃ আলম ফকির। আর মায়ের নাম মোছাঃ ফাতিমা।

জন্মের পর থেকেই সালমা চোখে দেখতে পায় না। জন্মের ৩ মাসের মাথায় তার মা মারা যায়। একে তো মা নেই, তার উপর চোখে দেখে না। তাই পড়ালেখা করার কথা ভাবনাতেও ছিল না তাদের।

একদিন তাদের এলাকায় 'জাগো নারী' ইসিডিএসপি-বি প্রকল্প কাজ শুরু করে। সিডা ও আগা খান ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় এই প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। এই 'জাগো নারী'র সাথে পরিচয় হওয়ার পরই সালমার মাথায় পড়ালেখার এই ভাবনা আসে। এরপর সালমা নিরালা প্রি স্কুলে ভর্তি হয়। সালমা প্রি-স্কুল শেষ করে ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে। সে এরপর কদমতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। সেখানে সালমা প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী। স্কুলের সবার সাথে সুন্দর সম্পর্ক তার। পড়া-লেখাতেও বেশ ভালো করছে সে। আর সবকিছুই সম্ভব হয়েছে 'জাগো নারী'র সহায়তায়।

এখন প্রতিদিন বাবা তাকে স্কুলে দিয়ে আসে। আবার ছুটি হলে বাড়িতে নিয়ে আসে। সালমা এই সুযোগ পাওয়ার কারণে 'জাগো নারী'র প্রতি কৃতজ্ঞ। কারণ 'জাগো নারী' কাজ শুরু করার কারণেই সালমা আক্তার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছে। আর তাই সালমা আজ বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। সালমার এখন আশা, আগামীতেও এই প্রকল্প যেন এভাবেই অসহায় মানুষের জন্য কাজ করে। তাহলে সালমার মতো অনেকেই পড়ালেখা শিখতে পারবে। তারাও সমাজ ও দেশের সম্পদে পরিণত হবে।

হুমায়ন কবির
সুপারভাইজার, ইসিডিএসপি-বি প্রকল্প
জাগো নারী, বরগুনা

পাহাড়ের মাটি কেটে ট্রেন চলাচলের রাস্তা তৈরি করা হয়। যাকে ট্যানেল বলে। একটি ট্রেন এরকম একটি টানেলে বা গুঁহায় ঠিক ৭টায় প্রবেশ করল। একই দিনে ঠিক ৭টায় টানেলটির অপর দিক দিয়ে আরেকটি ট্রেন প্রবেশ করল। টানেলটিতে ট্রেন যাওয়ার ঐ একটাই লাইন বা পথ। আশেপাশে অথবা উপড়-নিচে আর কোনো পথ নেই। কিন্তু ট্রেন দুইটি কোনো রকম দুর্ঘটনা ছাড়াই ঐ টানেল দিয়ে নিজ নিজ জায়গায় চলে গেল। কীভাবে এটি সম্ভব হলো?

জানুয়ারি-২০১২ সংখ্যার উত্তর

একই সংখ্যা ৩ বার ব্যবহার করে হয়- ১০+১০+১০ = ৩০

এখন থেকে আলাপ নিয়মিত ওয়েব সাইটে দেখতে পাবেন। এজন্য ক্লিক করুন...
Web: www. ahsaniamission.org.bd

সম্পাদক কর্তৃক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি ১৯, সড়ক ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা ঢাকা-১২০৯ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৫৯০৯
The ALAP-Monthly Easy to Read News Letter, Published by Dhaka Ahsania Mission